Journal of Gono Bishwabidyalay
ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)
Journal Homepage:
https://gonouniversity.edu.bd/research/journal-of-gb/

Review Article

চৌধুরী ডা: জাফরুল্লাহ্, "সবার জন্য গণতন্ত্রের সুফল"

মোঃ আলী আজম খান[১]*
[১]রাজনীতি ও প্রশাসন বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪।

Corresponding Author: মো: আলী আজম খান; Email: drzamkhan1970@gmail.com; Mobile: +8801871057735.
Received: 13/05/ 2025; **Accepted**: 09/09/2025; **Published**: 15/09/2025.

ডা: জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী তার জীবদ্দশায় রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য পাঁচটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেই পাঁচ প্রস্তাবের প্রথম প্রস্তাবটি ছিল "সবার জন্য গণতন্ত্রের সুফল"। জনাব চৌধুরী তার প্রস্তাবে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের সমসাময়িক চিত্রপট খুব স্পষ্টভাবেই তুলে ধরেছেন। রাষ্ট্রীয় দূর্নীতির কথা বলতে গিয়ে তিনি তার বক্তব্যের প্রারম্ভে বলেছেন, 'রাতের ভোট কারচুপির দেশ হিসেবে সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশ পরিচিত' ডা: জাফরুল্লাহ্ চৌধুরীর এই বক্তব্যের ভিতর দিয়ে দেশের প্রকৃত স্বরূপটি ফুটে উঠেছে। অপর দিকে রাষ্ট্রীয় মুখপাত্রগণ জনগণের নিকট প্রতিনিয়ত উন্নয়নের কথা তুলে ধরছেন। ডা. চৌধুরীর বর্ননা মে ত রাষ্ট্রকর্তৃক ভোট কারচুপির এইরুপ অবস্থান থেকে উন্নয়নের কথা ছিল মূলত একটি ধোকাবাজি। ডা: জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী এই প্রেক্ষিতে লিখেছেন যে, 'উন্নয়নের বিপরীতে চরম দূর্নীতি, খুনখারাবি, যৌন নিপীড়ন ও কিশোর গ্যাং এর দ্রত বিকাশ ঘটছে। তিনি সুদৃঢ়ভাবে বলেছেন, যেখানে জনগণের জীবনের নিরাপত্তা নেই। সেখানে সরকারের উন্নয়নের ঢাকঢোল কার জন্য। জনগণ কি এই উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে? জনাব চৌধুরীর এই মৌলিক প্রশ্নটির সঙ্গে দ্বিমত করার কোন সুযোগ নেই।

ডা: জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী দেশের বিদ্যমান এই অবস্থার উত্তরনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে সকল নাগরিকের জন্য বসবাসযোগ্য অসাম্প্রদায়িক জনকল্যানমূলক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মানের প্রস্তাব দিয়েছেন। তার অভিমত হচ্ছে দেশে অবাধ, গ্রহনযোগ্য ও সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা ফিরে আসুক। জনাব চৌধুরী তার প্রথম প্রস্তাবে জোড়গলায় সবার জন্য গনতন্ত্রের সুফল নিশ্চিত করনের কথা বলেছেন। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গণতন্ত্র স্বীকৃতি পায় [১] ।দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল সমূহ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং সর্বস্তরের জনগণ গণতন্ত্রের পক্ষে সহমত পোষণ করে। কিন্তু তারা আজও গণতন্ত্রের প্রকৃত অর্থের বিভ্রান্তিতে রয়েছে। জণগণের অধিকাংশই মনে করে যে, গণতন্ত্র মানে ভোটের অধিকার লাভ করা। ডা: জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী রাতের ভোট কারচুপি দেখতে চান না, তিনি নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চান। ডাঃ চৌধুরী ভোটাধিকার প্রয়োগের ভিত্তিতে জনঅংশগ্রহন নিশ্চিত করে শোষন বঞ্চনা প্রতিহত করতে চান। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনঅংশগ্রহনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে Gettell বলেছেন, "Democracy is that form of government in which the mass of the population possesses the right to share in the exercise of sovereign power" [২] । ব্যক্তির ভোট প্রয়োগের অধিকার প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক। আর এই গণতন্ত্র সর্ম্পকে রুশো বলেন, 'সামাজিক সর্বপ্রকার শক্তির উৎস হল জনগণ। তিনি আবার অকপটে স্বীকার করেন যে, গণতন্ত্রের নামে জনগণ দাবার ঘুঁটি হয়ে দাড়ায় প্রায় ক্ষেত্রেই অর্থাৎ গণতন্ত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গণতন্ত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী জনগণ। জনগণের সিদ্ধান্ত গ্রহন সম্পর্কে *গুস্তাভ লা বোঁ* বলেছেন, জনতা কখনো বিপ্লবের মুহূর্তে তাদের জীবন উৎসর্গ করতে এতটুকু কুন্ঠাবোধ করে না। এটাও বিরল নয় যে, কোন সেনাপতি ঘটনাচক্রে জনপ্রিয় হয়ে উঠলে, শত সহস্র ব্যক্তি তার অভিষ্ট লক্ষ্যের জন্য প্রাণবিসর্জন দিতে এতটুকু পিছ-পা হয় না। যদিও জনতার লক্ষ্য হাসিলের প্রক্রিয়া উদ্দাম-তবুও একথা সত্য যে সেটা ক্ষণস্থায়ী[৩] । রুশো যেমন গণতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন, *গুস্তাভ লা বোঁ* তেমনি জনতার শক্তি কে স্বীকার করে বলেছেন, জনতা যদি সচেতন বা জ্ঞানবান না হয়, তাহলে জনতা নিজের চিন্তাকে কাজে না লাগিয়ে অন্যের চিন্তা দ্বারা পুরোমাত্রায় প্রভাবিত হয়। জনতা তখন সকল প্রকার নির্দেশনা, চিন্তাভাবনা ছাড়াই আবেগতাড়িতভাবে মাথা পেতে নেয়। *গুস্তাভ লা বোঁর* মূল

কথাটা হলো, জনতা যদি আবেগপ্রবনভাবে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে সেক্ষেত্রে নানা বিকৃতি ও ঘটে। তিনি বলেন অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিত্ব যখন একটা জনতার অংশ হয়ে দাঁড়ান তখন দেখা যায়, তারা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে যে পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করার অধিকারী তা জনতার অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে উবে গেছে [৩] । জনতা সম্পর্কে গুস্তাভ লা বোঁর এই ধারণা প্রমান করে যে, জনগণ সচেতন না হলে গণতন্ত্রের সফলতা নাও আসতে পারে। রাতে ভোট প্রয়োগের সংস্কৃতিতে জনতার একাংশের সমর্থন গণতন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ব্যহত করেছে। সর্বসাধারনের ভোটের অধিকার অর্জণ করতে হলে জনগণকে কে গণতন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ধারণ করে সচেতন হতে হবে।

সমসাময়িক বিশ্বের পশ্চিমা পূজিবাদী দেশগুলি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিনিয়তই সুশাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলে চলেছে। অর্থ ঋন প্রদানকারী বৃহৎ দাতা প্রতিষ্ঠান সমূহ বিশেষ করে বিশ্ব ব্যাংক সুশাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। ডা: জাফরুল্লাহ ও জোড় দিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশ্বব্যাংক এবং ডা: চৌধুরীর সহমত থকলেও সচেতন মহলের একটি প্রশ্ন হলো সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক কিংবা পাশ্চাত্যের দেশগুলি নৈতিকভাবে কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। আপাতদৃষ্টে পাশ্চাত্যের এই ভূমিকার অন্তর্নিহিত কারণ হচ্ছে নব্য সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা। যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি পুজিবাদী অর্থনীতির বাজার নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থায়। পাশ্চাত্যের নিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের পরামর্শ পরস্পর বিরোধী। পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো মূলত নিজেদের সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সোচ্চার। পাশ্চাত্যের শাসকদের ন্যায় উপমহাদেশের শাসকগণ ও একই পথে হাটেন এবং গণতন্ত্রের লেবাস খুলে ফ্যাসিবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটান। এক্ষেত্রে রুশোর বক্তব্য যথার্থ, তিনি বলেন, সমগ্র মানবজাতি ভেড়ার পালের মতো ভিন্ন ভিন্ন দলে বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ও প্রত্যেক দলের অধিনায়ক তাদের সংরক্ষন করে শুধু সুবিধামতো তাদের ভক্ষণের অভিপ্রায়ে [৪] । বর্তমান বিশ্বের উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো প্রকৃত সুশাসনের মডেল নিশ্চিত করতে পারেনি। কারন তাদের প্রচলিত গণতন্ত্রে প্রজ্ঞা এবং সুচিন্তার বিষয়টি উপেক্ষিত। এ ক্ষেত্রে রুশো বলেছেন, যা সমাজের জন্য মঙ্গলময় তা নির্ধারিত ও নিরূপিত হোক সুচিন্তিত সত্য-মননের দ্বারা [৫] ।বর্তমানে প্রচলিত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে যদি জন উপযোগী করতে হয় তাহলে গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে প্রজ্ঞাবানদের অংশগ্রহন অপরিহার্য। এবং জনপ্রশাসনের স্বচ্ছতা দ্বায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা থাকাটা জরুরী। জনপ্রশাসনকে কার্যকরভাবে গতিশীল করতে হলে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরন প্রয়োজন।

ডা: জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী তার প্রস্তাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এবিষয়টি স্পষ্ট যে, পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেলেও যা প্রাচ্যে অনুউপস্থিত। প্রাচ্যের তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসকগন প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরনের ভেতর দিয়ে স্বৈরাচারী হয়ে উঠে প্রতিনিয়ত। জনাব চৌধুরী প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরনের এই প্রবণতাকে প্রত্যক্ষ করেই বিকেন্দ্রিকরনের উপর জোর দিয়েছেন। সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রিকরণ এবং চারস্তর বিশিষ্ট। প্রশাসন কেন্দ্র থেকে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যন্ত বিস্তৃত। জনাব ডাঃ চৌধুরী সংবিধান সংশোধন করে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী উপস্থাপন করেছেন। এককেন্দ্রিক এবং প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা মূলত একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। জনাব জাফরউল্লাহ্ চৌধুরী প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরণের অচলায়তন ভাংতেই মূলত ব্যাপকভাবে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণের কথা বলেছেন। তিনি প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় সমগ্র বাংলাদেশকে ১৭টি প্রদেশে বিভক্ত করার কথা বলেছেন এবং প্রতিটি প্রদেশে ১০০টি আসন বিশিষ্ট আইন সভা স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই আইন সভার সদস্যগণ জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। ইতিপূর্বে বাংলাদেশে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, জাতীয় পাটির্র সাবেক চেয়ারম্যান প্রয়াত রাষ্ট্রপতি হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ এবং বাংলাদেশের প্রথিতযশা রাজনৈতিক তাত্ত্বিক সিরাজুল আলম খান বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রাদেশিক শাসনের অর্ন্তভুক্তির কথা বলেছেন। জনাব খান দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় সংসদের কথা বলেছেন। তিনি নিম্ন কক্ষে ৩০০ আসন এবং উচ্চ কক্ষে ২০০ আসন বিশিষ্ট সংসদের কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে প্রদেশ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি ৭ অথবা ৯টি প্রদেশের কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের প্রাদেশিক সরকার কাঠামো নিয়ে কিছুটা মত পার্থক্য থাকলেও দুজনেই বিকেন্দ্রিকরণ প্রক্রিয়া হিসেবে বাংলাদেশকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করতে চান।

বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। পাকিস্তান বা ভারতের অনেক প্রদেশের আয়তন বাংলাদেশের আয়তনের কাছাকাছি। সেখানে বাংলদেশকে সাতটি বা সতেরোটি প্রদেশে বিভক্ত করা কতোটা বাস্তব সম্মত সে প্রশ্ন এসেই যায়। ভিন্ন দিকে প্রদেশে বিভক্ত করার যুক্তিটিই বা কী? সাধারণত ভারতবর্ষে আগে ভাষা, সংস্কৃতি আলাদা হলে সেগুলিকে আলাদা রাজ্য বা প্রদেশে বিভক্ত করা হতো। সিরাজুল আলম খানের সাতটি বা জাফরুরল্লাহ্ চৌধুরীর সতেরোটি প্রদেশে বিভক্ত করার পিছনে তাহলে কার্যকারণ সম্পর্কটি কী বলে ধরে নেয়া যায়? প্রদেশের সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেই কি বিকেন্দ্রিকরণ লাভ করা সম্ভব? বিষয়টির মধ্যে একটি

বৈপ্লবিক চিন্তা রয়েছে। বিকেন্দ্রীকরন প্রক্রিয়াকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রদেশের সংখ্যা না বাড়িয়ে বিদ্যমান সংবিধানের প্রশাসনিক কার্যধারায় বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে আইনগতভাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ডাঃ জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী বলেছেন, প্রতিটি প্রদেশে আলাদা সংসদ থকবে। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনসাধারণের গণতান্ত্রিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে ভোটে নির্বাচিত ১০০ জন সদস্যের সংসদ দ্বারা সৃষ্টি হবে সুশাসনের প্রথম পদক্ষেপ। দীর্ঘদিন থেকে জাতীয় সংসদ অনেকটা অকার্যকর, এই প্রেক্ষাপটে প্রাদেশিক আইনসভার একাধিক সংসদ কিভাবে কার্যকর হবে? বরং তা জাতির মধ্যে বিভেদ বাড়াবে, জাতীয় সংহতি বিনষ্ট করবে।

স্বল্প আয়তনের বাংলাদেশ মাত্র একটি আধুনিক ক্ষুদ্র জাতি রাষ্ট্র। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অধিকাংশ জনগণ বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ধারক ও বাহক। এদেশে কিছু নৃগোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাকলেও ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বড় ধরনের কোন বিভাজন নেই। এইরূপ বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদি বাংলাদেশকে সতেরোটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয় তাহলে বিদ্যমান ব্যবস্থায় কোন্দল দেখা দিতে পারে। এছাড়া ডাঃ চৌধুরী যে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ চাইছেন সেটা অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। সেজন্য বিভাগীয় পর্যায়ের জেলা ও উপজেলা গুলিকেই কার্যকরভাবে বিকেন্দ্রিকরণের আওতায় আনা যায়। এজন্য প্রয়োজন সাংবিধানিকভাবে প্রশাসনিক সংস্কার। ডাঃ চৌধুরী সতেরোটি প্রদেশ চেয়েছেন বিকেন্দ্রিকরণ করার লক্ষে। আবার বলেছেন, প্রদেশগুলির একজন প্রশাসক বা গভর্নর নিযুক্ত হবে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা। এক্ষেত্রে প্রদেশের মূল ক্ষমতা তো তিনি কেন্দ্রের হাতেই দিয়ে দিচ্ছেন। ভারতের সংবিধানে তাই রয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যপালকে নিয়োগ দেবেন। রাজ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে মনে করলে রাজ্যপাল সংসদ ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন বা জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সবসময় চাইতো ভারতের সকল ক্ষমতা থাকবে কেন্দ্রের হাতে। জিন্নাহর সঙ্গে কংগ্রেসের মূল বিরোধ ছিলো এটাই। ভারত ভাগ হয়েছিল এই প্রশ্নেই। জিন্নাহ মনে করতেন সকল ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগুলির হাতে-কেন্দ্রের হাতে থাকবে পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা প্রভৃতি[৮]। মন্ত্রীমিশন পরিকল্পনায় সকল ক্ষমতা রাখা হয়েছিল প্রদেশগুলির হাতে, সে কারণেই কংগ্রেস সে পরিকল্পনা মেনে নেয়নি। জিন্নাহ মেনে নিয়েছিলেন। কংগ্রেস মন্ত্রীমিশন পরিকল্পনা না মেনে নিলে ভারত ভাগ হয়ে যায়। কংগ্রেস অতঃপর সংবিধানে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত করে [৬]।

জনাব চৌধুরী বেকেন্দ্রিকরণের কথা বলে গভর্নর হিসেবে প্রধানত চাইছেন সরকারী আমলাদের-অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, সেনা বা পুলিশ প্রধান এবং সচিবদের। কিন্তু বিকেন্দ্রিকরণ চাইলে গভর্নর হতে হবে নির্বাচিত ব্যক্তি। ব্রিটিশ উপনিবেশ প্রবর্তিত যে আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই প্রেক্ষাপটে আমলাতন্ত্রের প্রাদেশিক সম্প্রসারণ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কতটুকু কার্যকারিতা লাভ করবে। বর্তমান প্রশাসনের কেন্দ্রীকরণ প্রবণতার পেছনে আমলাতন্ত্রের স্বার্থ রয়েছে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের জন্য প্রশাসনের সকল পর্যায়ে জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

প্রশাসনকে জন-উপযোগী করতে বর্তমানে উন্নয়ন প্রশাসনের ধারণা বিস্তৃতি লাভ করলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় সেটি সফলতা লাভ করছে না। ডাঃ জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী প্রস্তাবিত প্রদেশের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ কোটাপদ্ধতি প্রাদেশিক নাগরিকদের অধিকারকে সংকুচিত করতে পারে। প্রশাসনিক দক্ষতা বিবেচনা প্রসূত ১০ শতাংশ কোটা অন্য প্রদেশে সংরক্ষিত হতে পারে। যদিও বর্তমান প্রশাসনিক আইনে চকুরীতে বিভিন্ন কোটা পদ্ধতি বাতিল করা হয়েছে। প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জনের জন্য মূলত আন্তঃপ্রদেশ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা বিনিময় করা যেতে পারে। জনাব চৌধুরী আইনের প্রতি মূলত শ্রদ্ধাশীল পুলিশের কথা বলেছেন, বাংলাদেশের বাস্তবতায় আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করে থাকি যে, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী পুলিশ বাহিনী আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। পুলিশী হেফাজতে নির্যাতন এবং খুনের ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটছে। বৃটিশ উপনিবেশিক পুলিশী দমন নীতিতে আইন মান্যতার সংস্কৃতি বির্নিমান করা কঠিন। পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ এবং জাববদিহিতা ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পুলিশ বাহিনীতে সেবার মান বৃদ্ধি পেতে পারে।

প্রস্তাবনায় ডাঃ চৌধুরী নারী নির্যাতন প্রতিরোধে রাতে গণপরিবহনে সাদা পোষাকে পুলিশ মোতায়েনের কথা বলেছেন। পুলিশ হেফাজতে নারীর সম্ভ্রমহানী এবং দিনাজপুরে পুলিশ কর্তৃক ইয়াসমিনের সম্ভ্রমহানী ও খুনের ঘটনা দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে আরও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ। নারীদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক একটি সমন্বিত উদ্যোগ বিবেচনা করা যেতে পারে। এছাড়া পুলিশের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নতুন আইনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ব্রিটিশ শাসনেই 'অনুসন্ধান' পত্রিকায় পুলিশের চরিত্র সম্পর্কে লেখা হয়েছিল, কতকগুলি অভদ্র দৃবৃত্ত লোকের সমবায়ে পুলিশ বিভাগ কলঙ্কিত হতে বসেছে। পুলিশের ঘুষ খাওয়া, মিথ্যাচার ও মানুষকে অকারণে নির্যাতন বা হয়রানির ঘটনা নিয়ে সে আমলে বহু পত্রিকায় খবর ছাপা হয়েছে এবং মন্তব্য প্রতিবেদন লেখা হয়েছে। পুলিশের দ্বারা সুযোগ পেলেই নারীদের প্রতি পাশবিক অত্যাচারের বর্ণনাও রয়েছে সেসব সংবাদে [৭]।

প্লেটোর আইন সংক্রান্ত গ্রন্থটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, দুর্নীতি, ঘুষ গ্রহণ দু-আড়াই হাজার বছর আগেও ছিল। সেখানে একথাও বলা আছে, ন্যায় হল অধিকতর শক্তিমানের স্বার্থ [৮] বর্তমানে পুলিশ হচ্ছে শাসকদের স্বার্থ দেখার লাঠিয়াল বাহিনী। জনগণের জন্য এই পুলিশ কি করতে পারে? মুঘল আমলে জনগণের মঙ্গল ও নিরাপত্তা বিধানে প্রাদেশিক প্রতিনিধির দায়দায়িত্ব সম্পর্কে আইন-ই-আকবরীতে বলা হয়েছে। কখনো তিনি প্রজাদের কথায় বিস্মৃত হবেন না। তিনি দাম্ভিক ও রুক্ষ মেজাজের হবেন না। প্রত্যেক কাজে তিনি তার চেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তির পরামর্শ নেবেন। বিচারকার্যে শুধু সাক্ষী ও হলফের উপরই আস্থা রাখবেন না। বাদী-বিবাদীর চেহারা পর্যবেক্ষণ ও নিজের অন্তরদৃষ্টির ব্যবহার দ্বারা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। প্রশাসককে বলা হয়েছিল, তিনি যেন কৃষকদের বন্ধুত্ব লাভকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের উৎকৃষ্ট নির্দশন বলে মনে করেন [৯] । এই নির্দেশনার ভিতর দিয়ে প্রশাসকের নৈতিক ও আর্দশিক বিষয়কে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। মুঘল আমলে নিজামত ও দীউয়ানি শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণ প্রত্যক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে প্রশাসকগণ তাদের কাজের জন্য সম্রাটের নিকট জবাবদিহি করতেন [১০] । স্থানীয় পঞ্চায়েতের হাতে ছিল অনেক ক্ষমতা। জমিদার স্বাধীনভাবে স্থানীয় প্রশাসন চালাতেন। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন সম্রাটের মূল আইন মান্য করে।

মুঘল প্রশাসন জাতিভেদে ধর্মীয় আইন বলবৎ করে সহনশীলতার সংস্কৃতি বির্নিমাণ করেছিলেন। রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে কৃষকদের প্রতি সদয় আচরণ ও স্থাণীয় রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধা ছিল মুঘল প্রশাসনের স্তম্ভ। মুঘল আমলে ভূমিহীন কৃষক বলে কিছু ছিল না। ব্রিটিশ আমলে ভূমিহীন কৃষকের উৎপত্তি। মুঘল আমলের উল্লেখিত একটি গৌরবময় প্রশাসনিক ঐতিহ্য থাকলেও পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ শাসনে তা ভেঙ্গে পড়ে। ব্রিটিশ শাসনে জমিদারী প্রথার বিপরীতে যে পুলিশদের প্রশাসন রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয় তা জনগণকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়। বরং প্রশাসনের এই মানুষগুলিই জনগণকে নিরাপত্তা দেয়ার পরিবর্তে, জনগণের উপর জুলুম নির্যাতন চালাতো। কখনো সে নির্যাতন ভায়বহ রূপ নিতে থাকে। সে ধারাই ভারত-পাকিস্তান হয়ে বাংলাদেশে এখনো বজায় রয়েছে। জাফরুল্লাহ চৌধুরী সেই প্রশাসনে বা পুলিশী ব্যবস্থায় পরিবর্তন না এনে তাদের দ্বারা জনগণকে নিরাপত্তা বা সেবা দেবার কথা বলেছেন। বাস্তবে সেটা কতোটা কার্যকর হবে?

জনাব চৌধুরী নতুন প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের নিয়োগে সংসদকে যুক্ত করতে চাচ্ছেন। তিনি লিখেছেন, 'পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যদের জীবনপঞ্জী জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে নিয়োগের পূর্বে প্রকাশ করা হবে। তাদের নিয়োগ সংসদ দ্বারা চূড়ান্ত করা হবে।' বর্তমান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ। এক্ষেত্রে দূর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। কমিশনের সদস্যদের নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয়করণ স্পষ্ট। এই প্রক্রিয়া যদি সংসদের নিকট অর্পণ করা হয় তাহলে দলীয়করণ আরও বৃদ্ধি পাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমলাতন্ত্র স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধের কাছে জবাবদিহিতা করতে বাধ্য হবে, ততক্ষণ আমলাতন্ত্র বা প্রশাসন জনগণের হবে না। প্রশাসনকে প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী হতে হবে। সনদপ্রাপ্তধারী শিক্ষিত নয়, যাদের শিশুকাল থেকে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকবে, মানুষের সেবাপ্রদান করার শিক্ষালাভের ভিতর দিয়ে যিনি নতুনভাবে সমাজ এবং মানুষ সম্পর্কে নানারকম শিক্ষালাভের স্তর পার করবেন-তিনিই সরকারের প্রশাসনে কাজ করার জন্য অগ্রাধিকার পাবেন। প্রশাসনে যুক্ত হবার পর তাকে রাষ্ট্র-সমাজ-ইতিহাস-দর্শন সম্পর্কে একটি দুবছরের উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। প্রশাসনের সকল কাজ সম্পূর্ণভাবে মাতৃভাষায় পরিচালিত হবে। প্রথম দিকে এক পরিবারের দুজনকে প্রশাসনে চাকরি লাভের সুযোগ দেওয়া হবে না। অধিকসংখ্যক পরিবারের একজন যাতে যোগ্যতার ভিত্তিতেই প্রশাসনে বা সরকারি পদে চাকরি লাভের সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি তা করা যায়, তাহলে সেরকম ঘটনার ভিতর দিয়ে সমাজে একটি ক্ষমতাকাঠামোর ক্ষেত্রে সমতা আসার সম্ভাবনা তৈরি হবে।

জনাব চৌধুরী প্রাদেশিক সরকারের আইন সভায় স্পীকার নিয়োগের ক্ষেত্রে বিরোধীদলকে প্রাধান্য দিয়ে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রদান করেছেন। নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে না সূচক ভোট প্রদানের বিষয়টিও নাগরিকদের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার সমুন্নত রাখে। যে কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার গঠনে রাজনৈতিক দলের কোন বিকল্প নেই কিন্তু বাংলাদেশের দ্বন্দ্ব সংঘাতপূর্ণ অসহিষ্ণু রাজনীতি প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থাকে কতটুকু উপযোগিতা প্রদানে সক্ষম হবে সেটিও ভাবনার বিষয়। এই প্রস্তাবনায় কেন্দ্র ও প্রদেশের নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ব্যবহারের বিষয়টি তৃণমূলের রাজনৈতিক বিভাজনকে কমিয়ে আনতে সক্ষম হবে এবং রাজনৈতিক অংশ গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া কমিউনিষ্ট পার্টি বাংলাদেশ জাতীয় নির্বাচনে দলীয় প্রতীকে ভোট দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন। এর ফলে দল কর্তৃক মনোনীত অযোগ্য প্রার্থীর রহিতকরণ ঘটবে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর সংসদে আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে।

জনাব চৌধুরী এই প্রস্তাবনায় স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের নৈতিক দায়িত্ব বলে অভিহিত করেছেন। এতে করে বিচার বিভাগের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ বহাল থাকবে। বর্তমানে বিচার বিভাগ আইনগতভাবে

স্বাধীনও নিরপেক্ষ হলেও শাসন বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মন্টেস্কুর Separation of Power এর কার্যকারিতা প্রয়োজন। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের অর্থ হচ্ছে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ স্বাধীন থাকবে। কোন বিভাগ কোন বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না [১১]। যেমন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রয়োগ করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ভোগ করেছে। ভারতে প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থা থাকলেও বিচার বিভাগ ততটা স্বাধীন নয়। অপরদিকে ব্রিটেনে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা থাকলেও বিচার বিভাগ আইনের শাসনকে সমুন্নত রেখে আধুনিক সমাজকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে।

ডাঃ চৌধুরী স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার কথা বলেছেন। বাংলাদেশে এখনও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বিচার ব্যবস্থা চলছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক চরিত্রের এই বিচারব্যবস্থা কখনোই স্বাধীন বা নিরপেক্ষ হতে পারবে না। মানুষকে বিচার করার দৃষ্টিভঙ্গির ভিতরেই পরিবর্তন আনতে হবে। নাগরিকদের অপরাধের মুখোমুখি করার আগে রাষ্ট্রকে জবাবদিহি করতে হবে-রাষ্ট্র নাগরিকদের প্রতি তার মৌলিক দায়িত্ব পালন করেছে কিনা। রাষ্ট্র যদি নাগরিকের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, খাদ্য, বাসস্থান আর চিকিৎসালাভের নিশ্চয়তা না দিতে পারে তাহলে নাগরিকদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বাড়বেই। সকল অপরাধ বিচারের আগে, অপরাধীর আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় আনতে হবে। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি তছরূপের বিচার আলাদা ধরনের আদালতে সমর্পণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি চাইলে সেখানে স্ব-ইচ্ছায় স্বাক্ষী প্রদান করে বিচার ব্যবস্থাকে তথ্য অবহিত করতে পারবেন। উচ্চতর আদালতে বিচারকরা বিচারকদের ভোটের ভিত্তিতে পদোন্নতি লাভ করবেন। আদালতের আইনজীবীরা এক্ষেত্রে আলাদাভাবে ভোট প্রদান করবেন। বিচারক আর সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের ভোটাধিকারে প্রধান বিচারপতির তিনজনের একটি প্যানেল তৈরি হবে। সরকার তাদের ভিতর থেকে একজনকে প্রধান বিচারপতি নির্বাচন করবেন। বাকী দুজন উপ প্রধান বিচারপতির পদ লাভ করবেন। বিচারপতিকে নিয়ে কোনো বিতর্ক দেখা দিলে বাকি দুজনের উপর ভার পড়বে তার মীমাংসা করার। সরকারি প্রশাসন সে ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের লক্ষ্যে উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হলে জনমনে ন্যায় বিচারের প্রত্যাশা জাগতে পারে।

ডাঃ জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী দেশ ও জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে রাষ্ট্র সংস্কারের যে প্রস্তাবনা-উপস্থাপন করেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপোযোগী। ২০২৪ এর ৫ই আগষ্ট সংগঠিত বিপ্লব উত্তর নতুন বাংলাদেশে রাষ্ট্র সংস্কারের যে দাবী উঠেছে তা সঙ্গত কারণেই জনাব চৌধুরীর দাবীর সঙ্গে অন্তঃমিল রয়েছে। প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের অধিকতর কল্যাণের নিমিত্তে প্রশাসনিক সংস্কার অপরিহার্য এবং সময়ের দাবী। এই প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রে বিদ্যামন আইন, প্রশাসন এবং বিচারিক কাঠামোর কার্যকর অবস্থান নির্ণয় এবং এর উপযোগিতার মানদন্ড বিশ্লেষণপূর্বক রাষ্ট্র সংস্কারের প্রয়োজনীতার নিরীখে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। রাষ্ট্র সংস্কারের কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশীজনদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। সকল রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ এবং আপামর জনগণের সম্মিলিত ঐক্যমতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র সংস্কার গৃহীত হলে তা জন উপযোগিতা সৃষ্টি করবে।

লেখকের অবদান

গবেষণার ধারণা ও কাঠামো প্রণয়নে গবেষক এবং চিকিৎসক ও প্রাবন্ধিক ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরীর উভয়েরই সমান অবদান রয়েছে। ড. মো: আলী আজম খান মূল গবেষণা ভাবনা, বিষয় নির্বাচন, প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা, সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও তার উপর বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা এবং প্রবন্ধের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুতের দায়িত্ব পালন করেছেন। তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা, যুক্তি ও ব্যাখ্যা সমৃদ্ধকরণ, ভাষাগত ও পরিমার্জন এবং প্রবন্ধের চূড়ান্ত সম্পাদনা সম্পন্ন করেছেন গবেষক নিজেই। প্রবন্ধের চূড়ান্ত সংস্করণ গবেষক মনোযোগ সহকারে পাঠ ও অনুমোদন করেছেন এবং এর বিষয়বস্তু ও বিশ্লেষণের যথার্থতার জন্য গবেষকের সাথে প্রাবন্ধিক যৌথভাবে দায়বদ্ধ থাকবেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণা কার্য সম্পাদনের সমগ্র প্রক্রিয়ায় যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছেন, তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই রাজনীতি ও প্রশাসন বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে, যাঁদের একাডেমিক সহায়তা, গবেষণামুখী পরিবেশ এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা এই গবেষণা কর্মটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। ধন্যবাদ জানাই বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের সম্মানিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের, যাঁরা গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য, দলিল ও প্রাসঙ্গিক সাহিত্য সরবরাহে আন্তরিকভাবে সহায়তা করেছেন। পরিশেষে, গবেষক, চিকিৎসক ও প্রাবন্ধিক ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী'র রাষ্ট্র-জনগণ সম্পর্কে তাঁর ভাবনা ও তাঁর সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের এই গবেষণার প্রেরণার

মূল উৎস। তাঁর সমাজ-রাষ্ট্র বিষয়ক ভাবনা ও সৃষ্টিশীল শক্তিকে ধারণ করে সকল গবেষক, রাজনীতিবিদ এবং পাঠক অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠায় সমতাভিত্তিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে বদ্ধপরিকর হবেন–এই আশা ও বিশ্বাস ব্যক্ত করছি।

স্বার্থের দ্বন্দ্ব

এই গবেষণা প্রবন্ধ **চৌধুরী ডাঃ জাফরুল্লাহ, "সবার জন্য গণতন্ত্রের সুফল"** এর সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ধরণের আর্থিক, সামাজিক সংগঠন; পেশাগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থের কোনোরকম দ্বন্দ্ব নেই। তবে রাষ্ট্রিক পরিচালনায় কাঠামোগত পরিবর্তনে অবিশ্বাসী, ডানপন্থী মতাদর্শ ও প্রগতিশীলতায় বিশ্বাসী নয়; এমন সব দল, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে। বামপন্থী, প্রগতিশীল, লিবারেল ও সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র কাঠামোয় বিশ্বাসী দল এবং মানুষের সাথে দ্বন্দ্ব নেই।

তথ্য নির্দেশিকা

১. হাসানুজ্জামান, আল মাসুদ, (২০০৯), বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স, ঢাকা, ইউ,পি,এল, পৃ.২৫
২. Garfield Raymond, Gettell, (1950), Political Science, Calcutta: The World Press Ltd, P.199
৩. বো, গুস্তাভ লা, জনতা, (২০১৬), নূর মোহাম্মদ মিঞা অনূদিত, ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, পৃ.১২
৪. বো, গুস্তাভ লা, জনতা, (২০১৬), নূর মোহাম্মদ মিঞা অনূদিত, ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, পৃ.১৪
৫. খান, সিরাজুল আলম, (২০১৯),স্বাধীনতা-সশস্ত্র সংগ্রাম এবং আগামীর বাংলাদেশ, ঢাকা: অঙ্কুর প্রকাশনী, পৃ.২৫৭-২৯৬
৬. চৌধুরী, রাহমান, (২০২০), ভারতভাগ: জিন্নাহ গান্ধীর রাজনীতি, ঢাকা: সংহতি প্রকাশন, পৃ. ২৯২-২৯৬
৭. চৌধুরী, রাহমান, (২০১৮), স্বাধীনদেশে ঔপনিবেশিক বিচার ব্যবস্থা, ঢাকা: সংহতি প্রকাশন, পৃ. ২৩৫
৮. চৌধুরী, রাহমান, (২০১৮), স্বাধীনদেশে ঔপনিবেশিক বিচার ব্যবস্থা, ঢাকা: সংহতি প্রকাশন, পৃ.২৫২
৯. চৌধুরী, রাহমান, (২০১৮), স্বাধীনদেশে ঔপনিবেশিক বিচার ব্যবস্থা, ঢাকা: সংহতি প্রকাশন, পৃ.৯০
১০. চৌধুরী, রাহমান, (২০১৮), স্বাধীনদেশে ঔপনিবেশিক বিচার ব্যবস্থা, ঢাকা: সংহতি প্রকাশন, পৃ.১৮
১১. Kapur, A.C. (2002), Principles of Political Science, New Delhi: S Chand & Company Ltd. P. 471